গল্প

ইচ্ছা

মাকিদ হায়দার

ছোট এই শহরটির দক্ষিণদিকের বেশ কয়েক মাইল দূরে এক কালের প্রমত্ত পদ্মা, বিশষত বর্ষাকালেই যার উগ্রমূর্তি সেই পদ্মার শাখা নদী হিসেবে শহরটির মাঝখানে দিয়ে প্রবাহিত হবার আগেই বিভক্ত করেছে পশ্চিমে রাধানগর আর এডওয়ার্ড কলেজ। পূর্বদিকে রয়েছে শান্ত শিষ্ট শহরটির থানা, থানাপাড়া, শালগাড়িয়া মহল্লা, দ্বিজু মারোয়াড়ীর পাটের গুদাম, বলাই ঘোষের গেঞ্জির গৌরি হোসিয়ারি, কোবাদ মিষ্টিঅলার বলাকা মিষ্টান্ন ভান্ডার এবং মোকারম হোসেনের রূপকথা সিনেমা হল।

এই সবগুলোর উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বহুদিনের পুরনো শ্মশানঘাট, সেই শ্মশানঘাটকে ছুয়ে সে চলে গিয়েছে আরো উত্তরের গাজনার বিলের দিকে পদ্মার শাখা হয়ে যে নদীটি এ শহরের পূর্ব পশ্চিম বর্ষকালে ঘিরে রাখে সে কিন্তু প্রমত্ত নয়, সে মাত্র মাস দেড় দুয়েকের জন্য সোমত্ত, এই নিরানন্দ শহরবাসীর কাছে, যাকে নিয়ে এতো কথা তারই নাম দিয়েছে এই নিরানন্দ শহরবাসী ইছামতী ইছামতী নদী।

শহরটির দক্ষিণ পাশ দিয়ে ঢাকা রোড, ঢাকা রোড দুটো গিয়ে মিশেছে এই শহরের পূর্বের দিকের ৩২ মাইল দূরের যমুনা নদীর পাড়ে নগরবাড়ি ঘাটে, ঘাটের ওপাড়ে নাকালিয়ার চর, বেড়া বাজার, দক্ষিণে আরিচা ঘাট, আরো দক্ষিণে গেলেই বঙ্গোপসাগর শহরটির বাসস্ট্যান্ড থেকে নগরবাড়ি হয়ে ঢাকা যাবার সময় হাতের বামে হলুদ দোতলা বাড়িটি, এই শহরের গণ্যমান্য ডাক্তার আবুল হোসেন এলএমএফ (ক্যাল.)-এর। আবুল ডাক্তারের বাড়ির পূর্বদিকেই এই নিরাপদ শহরের একমাত্র খ্রিষ্টীয় গীর্জাটি সেই ১৯৩১ সাল থেকে মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছে। উপাসকদের জন্যেই।

বেশ দিন কয়েক আগে থেকেই লাল, নীল, কাগজের মালা দিয়ে গীর্জাটিকে যেভাবে সাজিয়েছে স্থানীয় খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাতে যে কেউ দিনের বেলায় লাল, নীল কাগজের মালা এবং রাতের বেলার ছোট, ছোট জোনাকির মতো আলোজ্বলা, আলোনেভা দেখেই এই শহরবাসীর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যেই এই

লাল, নীল, কাগজের মালা, গীর্জার মাথার উপরে বিশাল একটি তারা, রঙ বেরঙের কাগজ দিয়ে তৈরি। এই মনোরম আয়োজন সব কিছুই আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে।

সজ্জিত সেই গীর্জার ঠিক উল্টো দিকের যে পাড়াটি, সেই পাড়াটিতে বেশ কয়েকজন উঠতি ধনী লোক ছাড়াও কয়েক ঘর দুধ, ঘি, বিক্রেতা এবং জনা কয়েক ইতিমধ্যেই পৈত্রিক দুধ, ঘির ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, তাদের বাড়ির দোতলার ছাদে গেঞ্জির সাদা থানগুলো লম্বা লম্বা বাঁশের চারকোনা জানালার ওপর যখন শুকাতে দেয়। তখন, ঢাকাগামী যেকোনো বাসযাত্রীর চোখে পড়বেই গেঞ্জির সাদা থানগুলোর ওপর হঠাৎ হঠাৎ কারো মনে হতে পারে ওটা বুঝি কাশফুলের বাগান, অথবা কয়েক হাজার বক পাখি এসে জড়ো হয়েছে ঘোষপাড়ার হরিশ ঘোষের বাড়ির দোতলায়। এই নিরাপদ শহরটিতেই আশ্বিন মাসের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত মাত্র একমাস দেড়মাসের জন্য পুরোপুরি সদানন্দ শহর হিসেবে সকলের কাছেই আদরিণী হয়ে ওঠে, এবং একই সঙ্গে আহলাদী হয়ে ওঠে এবং শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতী নদীটি তার বর্ষার জল কাউকে না জানিয়েই ঢুকে পড়ে শহরের পূর্বে পশ্চিমে।

পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমদিককার রাধানগর, পৈলানপুর এবং পাওয়ার হাউজ পাড়া থেকে শুরু করে এডওয়ার্ড কলেজের ছেলে মেয়েদের পারাপারের জন্য ব্রিটিশ সাহেবরা যে ব্রিজটি বানিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি নতুন ব্রিজ নামেই পরিচিত। তবে, আরো একটি ব্রিজ এ শহরের জজকোর্টের পশ্চিমদিকে নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলেও স্থানীয় লোকজনদের কাছে পুরাতন ব্রিজ নামে পরিচিতি পেলেও সেই ব্রিটিশ আমল থেকে সকলেই ব্রিজটাকে চেনে লাশ কাটা ব্রিজ নামে।

দিলালপুর মহল্লার ডা. আবুল হোসেন এলএমএফ (ক্যাল.)-এর উল্টো দিকেই ক্ষীতিশ ডোমের কালো ক্যানেস্তারা টিনের বাড়ি হলেও ক্ষীতিশ ডোম, সৌখিন বলেই দিলালপুর-গোপালপুর এবং লাহিড়ীপাড়ার লোকজন ক্ষীতিশের চেয়ে তাঁর মা-শোভা ডোমকে সকলেই কমবেশি চেনে জানে, বিশেষত ঐ তিন মহল্লার আসন্ন প্রসবা মা বোনদের কাছে শোভা ডোম দাইমা হিসেবে বিশ্বস্ত, আর সৌখিন ক্ষীতিশ ডোমের বাড়ির সামনের দিকে যে কয়েক চিলতে খালি জায়গা পড়ে আছে সেখানে সুন্দর গোলাপ আর গাঁদা ফুল, বেলি ফুলের যে নার্সারিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই দৃষ্টি আকর্ষণের পুরো কৃতিত্বই ঐ ক্ষীতিশ ডোমের, সৌখিন ক্ষীতিশ ডোম ফুল ভালোবাসে।

মাঝে মাঝে খুন খারাবির যে লাশগুলোকে লাশ কাটা ব্রিজের নিচে যে লাশকাটা ঘর আছে, সেই ঘরে যে দিন লাশের সুরতহাল করতে হয়, পুলিশ-ডাক্তার বাবুর সামনে, সেইদিনের সন্ধ্যেটিতে বেহুঁশ বেতাল, ক্ষীতিশকে পড়ে থাকতে দেখা যায় তারই ক্ষীতিশ নার্সারির আশপাশে। ফুল বাগানে।

দিলালপুরের শক্তিশালীদের বাড়ি থেকে 'খাঁটি বাংলা মদ' ইচ্ছে মতো পেট ভরে খেয়ে দেয়ে যখন বাসায় সে ফিরে আসে তখন হয়তো রাত বারোটা, একটা।

মা শোভারানী দরজা খুললেও স্ত্রী রেনুবালা, ঐ রাতে ঘরের দরজা না খুললেও তাকে প্রায় সারারাতই জেগে থেকে দেখতে হয় জানালা দিয়ে। লোকটি কি মারা গেলো, নাকি সারারাত ধরেই মাতলামি করবে ঐসব ছাইপাশ খেয়ে? নিজেকেই নিজে রেনুবালা প্রশ্ন করে, এমনকি দূরের ভাগ্যবানকেও, মানুষ হয়ে মানুষকে খুনই বা করে কেন, আবার সেই খুন হওয়া মানুষটির সুরতহাল করতেই বা মানুষের প্রয়োজন পড়ে কেন? আর আমার ক্ষীতিশকেই কেন ঐ সব খুনে লোকগুলোর পেট বুক, ছিঁড়ে ফেরে কলিজা-রেনুবালার মাথাটা যেন হঠাৎ করেই ঘুরে ওঠে, বুক পেট ছেঁড়া লোকদের কাছ থেকে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে আনতে গিয়েই রেনুবালা স্পষ্টই বুঝতে পারে পেটের বাচ্চা তিনমাস পেরিয়ে চার মাসে পা দিলো।

ক্ষীতিশ ডোমের বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে দুধ, ঘি-এর ব্যবসায়ী হরিশ ঘোষের লাল টুকটুকে দোতলা বাড়িটি বিঘে খানেক জমির ওপরে। আর সেই বাড়ির উত্তর দিকেই ঢাকা রোড, ঢাকা রোডের পাশেই সেই ১৯৩১ সাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে খ্রিষ্টীয় উপাসনালয়টি এই নিরানন্দ শহরে।

হরিশ ঘোষের ছোট ভাই বলাই ঘোষ, সেও মাঝে মাঝে ক্ষীতিশকে সঙ্গ দেয় খাঁটি বাংলা মদের আসরে, বলাই অচেতন হবার আগেই ক্ষীতিশকে একা রেখে তাকে প্রায় লুকিয়ে ফিরতে হয় নিজের বাড়ির দিকে। বলাই ঘোষ বাপ ঠাকুরের দুধ, ঘি-এর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে শুরু করেছে গেঞ্জির ব্যবসা। শহরের গেঞ্জি পট্টিতে কিছুদিন আগেই নিয়েছে দোকান, দোকানের নামটিও দিয়েছে স্ত্রী, গৌরীর নামে গৌরী হোসিয়ারি।

আবুল ডাক্তার এলএমএফ (ক্যাল.)-এর সৎপরামর্শেই সে দুধ, ঘি-এর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাড়ির ছাদে যখন গেঞ্জির থানগুলো শুকাতে দেয়, তখন আবুল ডাক্তারের কথা তার বেশি করে মনে পড়ে। বিশেষত বিয়ের আগে, যে গোপন অসুখটি তাকে ধরেছিলো ঈশ্বদীর বেপড়া থেকে, সেই গোপন অসুখের চিকিৎসা যদি ডাক্তার ঠিকঠাক সময় না করতেন, বা আমি যদি না সরাতাস তাহলে কি বিশ্রী কান্ডটাই না হতো। এবং একই সঙ্গে তিনি যদি দুধ ঘি-এর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে গেঞ্জি ব্যবসার বুদ্ধি না দিতেন, তাহলে আজকে ছাদের ওপর সাদা কাশফুলের মতো ধবধবে গেঞ্জির থান কাপড়গুলোকে গীর্জার কাছ থেকে আবুল ডাক্তারের বাড়ির দোতলা থেকে এমনকি বাসে চেপে যারা এই শহর থেকে নগরবাড়ি- ঢাকা যায়, তারা কোনোকালেই দেখতে পেতো না, এবং এই শহরের গেঞ্জি পট্টিতে গৌরী হোসিয়ারির নামে যে সাইন বোর্ড উজ্জ্বল তারার মতো জ্বলজ্বল করছে, এ সবের পেছনেই আবুল ডাক্তারের সৎবুদ্ধি। অবদান, ডাক্তার লোকটি ভালো। হোক না অন্য সম্প্রদায়ের, তিনি তো ডাক্তার- তিনি তো সব মানুষের জন্যেই।

গেঞ্জির থানগুলো নিজেদের পৈত্রিক বাড়ির ছাদে শুকোতে দিতে দিতেই বলাই ঘোষ স্ত্রী গৌরীকে ডাকলেন দোতলার ছাদে। ছাদে তখন দুপুরের কড়া রোদ, চৈত্র, বৈশাখের এই রোদেই গেঞ্জির থান শুকানোর জন্যেই উপযুক্ত রোদ। গৌরীর ইচ্ছে ছিলো বলাইয়ের ডাকে, রান্নাবাড়ির কাজকর্ম ফেলে সে দোতলার ছাদে যায়, গৌরী জানে, তার প্রিয় স্বামী, ইতিপূর্বে যা বলেছে আজকেও তাই বলবে, এবং একই দির্দেশ দেবে, দিলালপুরের অসীম ঘোষের ছেলে সন্তোষকে যেন চোখে চোখে রাখে, অকারণে যেন বীণার খোঁজ খবর নিতে না আসে, পায়রা খোঁজার ছল করে। সন্তোষ বেশ কিছুদিন থেকেই বীণার স্কুলে যাবার পথে গান্ধীবালিকা বিদ্যালয়ের আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করে। কারণে অকারণে সাইকেল চালিয়ে দেয় মেয়েদের গায়ের ওপর। হোক না সে দূর সম্পর্কের আত্মীয়, অসীম ঘোষ তো শহরের দই পট্টিতে মাটিতে বসে এমন কি কাঁধে 'বাঁক' চাপিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দই চাই দই চাই, বলে হাঁক দিয়ে বেড়ায়- সেই লোকের ছেলে সন্তোষের স্পর্ধা কত যে, গৌরী হোসিয়ারির মালিকের একমাত্র মেয়ে বীণাকে উত্ত্যক্ত করে, এবং আমার অনুপস্থিতিতে আসে পায়রা খুঁজতে, তুমি না বললেও চিত্তদা আর গোপালদা বিষয়টি লক্ষ্য করেছে, তাই তোমাকে বলে দিচ্ছি গৌরী হোসিয়ারির মালিকের মেয়ে যার তার ঘরে যাবার জন্যে পৃথিবীতে আসেনি।

বলাইয়ের এই একই কথা ইতিপূর্বে বেশ বার কয়েক গৌরী শুনেছে, বরং রাগ না করে হেসেই বলেছে।

ভুলে গেছো, তোমার নিজের কথা, সন্তোষরা তো তোমাদেরই দূর সম্পর্কের আত্মীয়, আজকে না হয় অসীমদা কাঁধে বাঁকে করে পাড়ায় পাড়ায় দই বিক্রি করে দই পট্টিতে। রান্নাঘর থেকে দোতলার ছাদে আসতেই স্বামী স্ত্রীর কথার মাঝখানেই হঠাৎ ভেসে এলো বড়োভাই হরিশ ঘোষের গলা।

বলাই, এই দিকে আয়।

বলতে বলতে হরিশ ঘোষ নিজেই উঠে এলেন দোতলার ছাদে। চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ভীতির একটা ছাপ জড়িয়ে আছে বড়ভাই হরিশের।

কি হয়েছে দাদা?

শুনলাম, এই মাত্রই শুনে এলাম পাবনা বাজার থেকে-

কি শুনে এলে?

হিমাংসু জানালো ঢাকায় গতরাতে পাকিস্তানি আর্মিরা কয়েক হাজার পুলিশ-ইপিআরকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে গুলি করে মেরে ফেলেছে,

শহরের বাড়িঘর নাকি আগুন দিয়ে- জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, যেখানে যাকে পাচ্ছে গুলি করে মেরে ফেলছে- যদি তাই হয় তাহলে আমাদেরকেও এদেশ ছেড়ে...

অগ্রজ হরিশ ঘোষের মুখ থেকে কথা না বের হলেও হলো গৌরীর মুখ থেকে-

যদি ঘটনা সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে তো আমাদের সকলকেই চলে যেতে হবে ওপাড়ে, ওপাড়ে গেলে আর কিছু না হোক জীবনটা তো রক্ষে পাবে।

গৌরীর কথার উপরে যতোটা গুরুত্ব বলাই না দিলেন, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন ভাশুর হরিশ ঘোষ, তিনি গৌরীকে সমর্থন দিলেন দুটি কারণে,

১. বীণা বড়ো হয়েছে, দুর্ঘটনা যে কোনো সময় ঘটতে পারে।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাবার কাছ থেকে শুনেছি, আর্মিরা পশুর চেয়েও অধম, পাকিস্তান আর্মিরা হিন্দু, মুসলমান যখন কিছুই মানছে না, তখন এ দেশে থাকা ঠিক হবে না। তবে তার আগে পাবনা বাজারে গিয়ে তুই আরো ভালো করে জেনে আয়, হিমাংসু বিশ্বাস কথাটি সত্যি বলেছে, নাকি শোনা কথাই, আমাকে শুনিয়েছে।

বলাই, বাড়ি থেকে বের হয়ে ঢাকা রোডের খ্রিষ্টীয় উপাসনালয়ের সামনে আসতেই প্রথমে দেখা হয়ে গেলো ক্ষীতিশ ডোমের সঙ্গে। তার একটু পরেই চিত্তদার সাথে, এবং সব শেষে দেখা হলো, আবুল ডাক্তার এলএমএফ (ক্যাল.)-এর সাথে। আবুল ডাক্তারই প্রথম বললেন, পরে চিত্ত ঘোষ, ক্ষীতিশ ডোম কোন কথা না বলে শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন তিনজনের কাছাকাছি।

কথাটি যে সত্য, নাকি সম্পূর্ণ গুজব সেটাই যাচাই করতে বলাই ঘোষ যখন তার গেঞ্জি পট্টির গৌরী হোসিয়ারির প্রায় কাছাকাছিতে এসে পৌঁছেছেন, ঠিক তখুনি তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, দ্রুতগতিতে ঢাকা থেকে ৪টি মিগ বোমারু বিমান অতিদ্রুত তার সাথে তারই মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে এডওয়ার্ড কলেজের মাঠের উপর, নাকি আশপাশের গ্রামগুলোর উপর ফেলে বালিশের মতো কি যেন ফেলে দিতে, না, দিতেই বিকট এক শব্দে এই নিরানন্দ পাবনা শহরটাকে কাঁপিয়ে জানান দিয়ে গেলো, মিগ বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে। বাড়ি থেকে যে রিকশায় নিজের গেঞ্জির দোকানের কাছাকাছি এসেছিলেন, সেখান থেকে ঐ একই রিকশায় ঘোষপাড়ায় নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েই সকলকে ডেকে বললেন,

আজ রাতের ভেতরেই যদি কুষ্টিয়া পাড়ি দিতে পারি তবে কাল পরশুর ভেতরেই নদীয়ায় বীণার মামার বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারবো, আমাদের এখন থেকে কুষ্টিয়া যেতে বেশি সময় লাগবে না, প্রমত্ত পদ্মা এখন শুকিয়ে হাড় জিরজিরে। মাত্র ১২ মাইল পথ। পদ্মানদীর চরগুলো আড়াআড়ি পাড়ি দিলেই মোহিনী মিলের গেট, অথবা সোজাসুজি গেলে লালন ফকিরের ছেউরিয়া। যদি যেতেই হয় তবে আজ রাতেই চলে যেতে হবে ঘরবাড়ি ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু ফেলে রেখে।

এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো শেষ করলেন বলাই ঘোষ, এবং একই সঙ্গে বাড়ির বউ ঝিদের বললেন,

টাকা পয়সা, সোনা, গইনা, যেন সাথে নিয়ে যাওয়া হয়। গোয়ালঘরের সব গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে পায়রার ঘরের দরজা খোলা রেখে ঠাকুরঘর থেকে মা কালীর আশীর্বাদ নিয়ে আজ সন্ধ্যার পরপরই যাত্রা করবো কুষ্টিয়া হয়ে কৃষ্ণনগর, নদীয়ার দিকে। প্রথমে গিয়ে উঠবো বীণার মামার বাড়ি, পরে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

বীণা বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে বাবার কথাগুলো যখন শুনছিলো, ঠিক তখনই অসীম ঘোষ, আর সন্তোষ এসে জানালো,

থানা পাড়ার বিহারী কসাইরা, গেঞ্জি পট্টিতে আগুন দিয়েছে, প্রথমে আগুন দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা বরকত হাজির গেঞ্জির কারখানায়।

আমাদের গৌরী হোসিয়ারিতেও?

প্রশ্নটি বীণার, অসীম কাকার দিকে। প্রশ্নটির উত্তর অসমী কাকা না দিলেও দিলেন সন্তোষ,

হ্যাঁ, শুধু তোমাদের একার নয়, গেঞ্জিপট্টিতে হিন্দু-মুসলমানদের যতোগুলো দোকান-কারখানা ছিলো, প্রায় সবগুলোতেই কসাইরা আগুন দিয়েছে, লুট করেছে সোনাপট্টির বসন্ত কর্মকারের সোনার দোকানে, হিমাংসু বিশ্বাসের রূপছায়া স্টুডিওতে এবং ইকবাল মিয়ার লেপ তোষকের দোকানও লুট করেছে। সেই সঙ্গে কুদ্দুস কসাই নাকি গিয়েছে ঈশ্বরদীতে বিহারি ছেলেদের আনতে। তাদের দিয়েই নাকি চালাবে খুন-খারাবি।

অসীম ঘোষ কথা শেষ কারার আগেই ঘোষপাড়া, দিলালপুর থেকে স্বজাতি, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর আরো দশ-পনেরোজন হরিস ঘোষের পৈতৃক বাড়ির উঠোনে এসে প্রায় সমস্বরেই জানালো এবং জানতে চাইলো হরিস আর বলাই ঘোষের অভিমত। তারা যদি আজ রাতের ভেতরে বাড়িঘর ফেলে রেখে ওপারে চলে না যায়, তাহলে ঐ ঈশ্বরদী থেকে আসা তরুণ বিহারি ছেলেদের হাতে, কুদ্দুস কসাইয়ের গরু কাটা চাপাতির নিচে জীবন দিতে হবে। এখন একমাত্র সমাধান, আজ রাতেই পালিয়ে যাওয়া। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে হরিস আর বলাই ঘোষের কথা চালাচালির পেছনে এসে শোভারানী দাইমা, সন্তান সম্ভবা রেনুবালা এবং রেনুবালার স্বামী একবুক সাহস সঞ্চয় করেই এসে দাঁড়িয়েছে ঘোষবাড়ির উঠোনে।

শোভারানী এবং তার একমাত্র ছেলে ক্ষীতিশ খুব ভালো করেই জানে, তারা নীচু জাত, ঘোষ বাড়ির উঠোনে দাঁড়ানোটা হয়তো অনেকের চোখেই ভালো লাগবে না। কিন্তু এই দৈব-দুর্বিপাকের সময়, না এসেও তো উপায় ছিলো না, ছিলো না বলেই তো জানতে এসেছে শোভারানী, তারাও কি বাড়িঘর ফেলে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাবে, নাকি হরিশ আর বলাই যা বলবে তাই শুনবে?

সেইটুকু শোনার জন্যেই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলো ক্ষীতিশ মা-বউকে নিয়ে। এই দাঁড়ানোর ফাঁকেই ক্ষীতিশের মনে হয়েছিলো,

১. বলাই আর আমি যখন চাকীবাড়িতে গিয়ে একই গ্লাসে 'খাটি বাংলা মদ' খাই তখন ঐ নীচু জাত, উঁচু জাত কোথায় থাকে?

২. দেখা যাক, বালাই আর হরিশদা কি করেন কি বলেন, নীচু জাত তাদের সঙ্গে যেতে পারবে কি না। অনেক আলাপ-আলোচনায় পর ঠিক হলো- টাকা-পয়সা, সোনা-গহনা আর সামান্য জামা-কাপড় নিয়ে আজকের সন্ধ্যার পরপরই যারা ওপারে যেতে চায়, তারা যেন ঠিকঠাক সময়মতো এই উঠোনে এসে জড়ো হয়।

উঠোনে সন্ধ্যার পর হিন্দু-মুসলমান এবং ঘোষপাড়া, দিলালপুরের আওয়ামী লীগের নেতা, তরুণ নেতাসহ শোভারানী, রেনুবালা এলেও শুধু এল না ক্ষীতিশ ডোম।

ক্ষীতিশকে না দেখে বলাই রেনুবালাকে জিজ্ঞেস করলেন-

ক্ষীতিশ কোথায়? ক্ষীতিশ যাবে না?

বলাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দাইমা শোভারানীই জানালেন,

ক্ষীতিশ যাবে না, বাড়িঘর দেখবে। তারচেয়ে বড় কথা, বিহারি কসাইরা ক্ষীতিশকে মারবে না। আমাদের বাড়িঘরও জ্বালাবে না।

হঠাৎ এতো বিশ্বাস জন্মালো কী করে বিহারি নাপিত, কসাইদের

প্রতি? জানতে চায় হরিশ ঘোষ নিজেই। হরিশ ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে রেনুবালা সবাইকে বেশ জোরে শুনিয়েই বললো,

লাশকাটা ঘরে লাশ এলে ওকে যদি খুঁজেটুজে না পায়, তাহলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে, এ কথা চিন্তা করেই ও থেকে যাবে এখানেই। এই পাবনা শহরেই।

বেশ তাহলে যাত্রা শুরু করা যাক। বলো হরি, বলো হরি, বলেই হরিশ ঘোষ, জ্ঞাতিগোষ্ঠীসহকারে যখন পদ্মার চরের দিকে এগিয়ে চলেছেন, ঠিক সেই সময় প্রায় দৌড়াদৌড়ি করে অসীম ঘোষ তার ছেলে সন্তোষকে নিয়ে এসে যোগ দিলেন হরিশ-দা বলাইদার পরিবারের সঙ্গে।

প্রমত্ত পদ্মা চৈত্র-বৈশাখ মাসে এমনভাবে শুকিয়ে যায়, যেন মনে হয় হেঁটেই পাড়ি দেয়া যাবে ও পারের কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের গেটে, কিংবা লালন শাহের ছেউরিয়া গিয়ে ওঠা যাবে। চরকোথাখালীর স্থানীয় নৌকার মাঝিরা পাবনা শহরের পলাতক মানুষগুলোকে সেই শুকিয়ে যাওয়া পদ্মা পার করিয়ে দিতেই রেনুবালা কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করলেন, এবং এক সময় শাশুড়ি শোভারানীকে ৪ মাসে পড়া পেটের বাচ্চাটির কথা জানালেও রেনুবালার মনে হলো, সে বুঝি আর হেঁটে সামনের দিকে এগোতে পারবে না। তার আগেই হয়তো বা পেটের ভেতরের বাচ্চাটিকে রেখে যেতে হবে।

এই চলার পথের যেকোনো জায়গায় এরচেয়ে ভালো ছিলো। ঐ ক্ষীতিশের বুকের ছায়ার নিচেই থাকা, ক্ষীতিশ ঠিকই বলেছিলো, সে যদি ঘরবাড়ি ছেড়ে যায়, তাহলে বাড়িঘর সবকিছু লুটপাট হয়ে যাবে। কিন্তু এই রক্তক্ষরণের মুহূর্তে বাড়ির উল্টোদিকের আবুল ডাক্তার কাকার কাছে গেলে অন্তত এই রক্ত ঝরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। কিছু ওষুধ টসুদ পেটে পড়লে বাচ্চাটা বাঁচতো নিশ্চয়ই। হয়তো বা বেঁচেও আছে।

নদীয়ায়, বীণার মামা প্রথম দুই রাত দুই দিন এতোগুলো লোকের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, অসম্ভব, হিন্দু-মুসলমান, ডোম-মেথর সবাইকে তার পক্ষে চালিয়ে নেয়া অসম্ভব, বিশেষত তিনি যখন স্বচক্ষেই দেখলেন হাজার হাজার লোকজন সবকিছু পেছনের পূর্ব পাকিস্তানে ফেলে রেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছে ভারতের মাটিতে উদ্বাস্তু হয়ে, তখন তারই নিকট জনেরাও মিশে যেতে পারবে ঐসব উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এবং উদ্বাস্তু শিবিরে নিশ্চয়ই তাদের আশ্রয় মিলবেই।

বলাই ঘোষ নিজে থেকেই বীণার মামাকে জানালেন,

আমরা সবাই উদ্বাস্তু শিবিরে চলে যেতে চাই, শুধু গৌরী আর বীণাকে রেখে যেতে চাই আপনাদের কাছে, বলাইয়ের প্রস্তাবটা বীণার মামা প্রায় লুফে নিয়েই বললেন,

ঠিক আছে, তাই করুন, বীণা আর গৌরী আমাদের কাছেই থাকুক, যতো দিন পর্যন্ত আপনাদের পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন না হয়।

উদ্বাস্তু শিবিরে এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই একদিন মাঝরাতে রেনুবালা তার শাশুড়ি দাইমা শোভারানীকে জানালো,

বোধ হয় ছেলে হয়েছিলো, পড়ে গেছে। রেনুবালাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে শোভারানী কোনো কথা না বলে নিজের চোখ দুটো মুছতে মুছতে প্রায় অসুস্থ স্বরেই তার মুখ থেকে বেলিয়ে এল-

সবই ভগবানের ইচ্ছা।

সেই ভগবানের ইচ্ছাটা পূরণ করলেন আল্লাহর ইচ্ছা হিসেবে। পাবনা শহরের দিলালপুরের আজিম উদ্দিন চৌধুরীর বাড়ির মসজিদের ইমাম আবদুল হাফিজ এবং মসজিদে যারা নামাজ পড়তে এসেছিলেন তাদের সবাইকেই বোঝালেন, একজন হিন্দুকে যদি মুসলমান বানানো যায়, তার জন্যে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। জান্নাতে ফেরদৌস। বেহেশত সেই মুসলমানের জন্যেই, যে মুসলমান হিন্দু খ্রিষ্টানকে ইসলামের পথে আনতে পারে। সেই ইসলামের পথেই এসেছে এই দিলালপুরের ক্ষীতিশ। সে ডোম হোক, চাঁড়াল হোক, সে এখন থেকে ইসলামের ছায়ার নিচে, শান্তির নিচে, তাকে জায়গা করে দিয়েছে স্বয়ং আল্লাতা'লা! ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান, বিশেষত যারা বিধর্মী ছিলেন বা আছেন, তাদের ভেতর থেকে আজকের এই সোনার পাকিস্তানের একজন বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করায় আল্লাহ তার জন্যে মৃত্যুর পরে জান্নাতুল ফেরদৌসে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হুরপরি, সাকি সূরা সবকিছুরই ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতাদের এক বংশধর কফিল জান চৌধুরী, ক্ষীতিশের নামটাও ঠিক করে রেখেছেন, আজ থেকে ক্ষীতিশকে আর ক্ষীতিস বলা যাবে না। ওর নাম রাখা হয়েছে ইউসুফ। ইউসুফ আলী।

ইমাম আবদুল হাফিজের কথা শেষ হতে না হতেই কফিলজান চৌধুরী উপস্থিত সবাইকে দেখিয়েই নিজের মাথা থেকে একটি নতুন জিন্নাক্যাপ, নবমুসলিম ইউসুফ আলীর মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললেন,

আপনারা উপস্থিত মুসুল্লিগণ ইউসুফের জন্য দোয়া করুন, সেই সঙ্গে সোনার পাকিস্তানের জন্য। মালুরা যা শুরু করেছে, সোনার পাকিস্তানকে দুই ভাগ করেই ছাড়বে ঐ ইন্দিরা গান্ধী আর শেখ মুজিবের দল ভাওয়ামী লীগ। ভাওয়ামী লীগ মানে হলো ভাঙনের লীগ দেখছেন তো, দেশটাকে ভেঙে মালুদের হাতে দেবার জন্যে কীভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, তবে শেষ কথা, আজকে আমার মাথা থেকে সোনার পাকিস্তানের পিতা যে ক্যাপ মাথায় দিতেন, যার নাম জিন্নাক্যাপ, সেই ক্যাপই আমি আমাদের ইউসুফ আলীর মাথায় পরিয়ে দিলাম। আশা করি, ঐ জিন্নাক্যাপের মানসম্মান ইউসুফ রাখতে পারবে।

উদ্বাস্তুর জীবন শেষ করে আর সবার সঙ্গেই রেনুবালা ফিরে আসবার আগে দাইমা শোভারানীকে শ্মশানে রেখে আর অসীম ঘোষ, তার ছেলে সন্তোষকে কলকাতার এক আত্মীয়ের হাতে তুলে দিয়ে সেই কুষ্টিয়া, সেই পদ্মানদীর চরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, একদিন সন্ধ্যারাতে হরিশ ঘোষ বলাই ঘোষের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পৌঁছালো, নিরানন্দ পাবনা শহরের নিজের বাড়ি দিলালপুর মহল্লায় ক্ষীতিশ ডোমের আমগাছ, নারকেল গাছ ফুলবাগান ঘেরা বাড়িতে।

ইউসুফ আলী সারা দিনই অপেক্ষায় ছিলেন কখন রেনুবালা আসে। তার আসবার অপেক্ষায়ই ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখবার সময়ই নিজের অজান্তেই জিন্নাক্যাপটি টেবিলের উপর রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ইউসুফ আলী।

রেনুবালাকে দেখে বাচ্চা ছেলেদের মতো কাঁদতে কাঁদতে ইউসুফ আলী জড়ানো গলায় কী যেন বারবার বলতে গিয়েও যখন বলতে পারছিলেন না, তখনই হঠাৎ করে রেনুবালা দেখতে পেলো টেবিলের উপর নতুন একটি জিন্নাক্যাপ,

এই ক্যাপ তোমাকে কে দিলো?

গলায় ঝাঁঝ মাখিয়েই জানতে চায় সদ্য ফিরে আসা রেনুবালা। ইউসুফ আলী ছলচাতুরির আশ্রয় না নিয়েই জানালো,

না হয়ে উপায় ছিলো না, বিহারিরা মেরে ফেলতো তারচেয়ে জীবন বাঁচাতে-

কথা শেষ করতে পারে না ইউসুফ আলী, তবু তাকে একসময় শেষ করতেই হলো,

এখন তুমিই বলো কী করবো, তোমার ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা, রেনুবালা প্রিয়তম স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজের চোখের জল কিছুতেই বাঁধ দিতে না পারলেও তবু তাকে একসময় বলতেই হলো,

জিন্নাক্যাপাটিকে মাটিতে পুঁতে রেখে এসো।

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**